উৎসর্গ

আমার জান্নাতের নামে, আমার কাঁটা-বিহীন গোলাপ যিনি, তার নামেই উৎসর্গ করি আমি এক দৌহিত্রী হয়ে।

উৎসর্গ করি তাদের, যারা ছিলো নিষ্পাপ ফুল। ফিলিস্তিনের রক্তমাখা মাটিতে যারা ফোঁটার আগেই ঝরে গেল। তাদের স্মৃতির পবিত্রতায় তারা ফুটবে আবার, জান্নাতের বাগিচায় শুধুই সুবাস হয়ে।

লেখকের কথা

"পরীজান"— একটি আবেগঘন শব্দ, যার প্রতিটি অক্ষরে লুকিয়ে আছে চোখের ভাষা, মনের স্পর্শ, আর কিছু সুপ্ত অনুভূতির নিঃশব্দ প্রকাশ। কখনো কল্পনাও করিনি, এই ভালোবাসা ও অনুভূতির গল্প একদিন বইয়ের মলাটে বন্দি হবে। আমার মনের গহীনের কথাগুলো এক একটি অক্ষরে রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে ধরা দেবে—এটা আমার কাছে এক অপার বিস্ময়, এক গর্বের মুহূর্ত।

এই যাত্রা একা সম্ভব হতো না। অনেক অনিশ্চয়তা, দ্বিধা আর সংকোচের মধ্যেও আমি সামনে এগিয়ে যেতে পেরেছি কিছু আপনজনের অবিচল সাহচর্য, ভালোবাসা ও মানসিক শক্তির কারণে। তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আর নিরব সহযাত্রাই আমাকে এই সাহস জুগিয়েছে।

এই বিশেষ মানুষগুলোর প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা রইলো। আপনারা পাশে না থাকলে এই বই কখনো আলোর মুখ দেখত না।

আপনাদের প্রতি জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ—

"আব্বা যেদিন দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে ফিরলেন তখন আমার বয়স দশ বছর, রুপার বয়স পাঁচ, আর পরীর বয়স মাত্র দেড় বছর। ছোট্ট পরীকে বুকে নিয়ে আম্মা সেদিন নীরবে চোখের জল ফেলেছিলেন। মুখে টুঁ শব্দটি করেননি প্রতিবাদ তো দূরের কথা। আর আমি সেদিন দরজার আড়াল থেকে আব্বার দ্বিতীয় বউয়ের মুখ দেখেছিলাম। আব্বার দ্বিতীয় বউ আমার আম্মার নখের যোগ্যও না। কারণ কালো একটা মহিলাকে বিয়ে করেছেন আব্বা, যেখানে আমার আম্মা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি সুন্দরী। তারপরও আব্বা ওই মহিলাকেই বিয়ে করেছিলেন। কারণ একটাই, আব্বার একটা পুত্র সন্তান চাই। নাহলে তার এতসব সম্পত্তি কে দেখবে? তার বাবার সাধের জমিদারির সাম্রাজ্য কে সামলাবে? যেদিন পরীর জন্ম হলো সেদিন আব্বা বাড়িতে ফেরেনি। কিন্তু তার কাছে ঠিকই খবর পৌঁছেছিল যে তার মেয়ে হয়েছে, সেজন্যই আব্বা রাগ করে বাড়িতে আসেনি। তার ঠিক দুদিন পর আব্বা বাড়িতে এসেছিল কিন্তু কারও সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। পরপর তিনটা মেয়ে জন্ম দেওয়ার জন্য আম্মাকে অনেক কথা শোনায় দাদি। আম্মা নাকি ছেলে জন্ম দিতে পারবে না। তার সঙ্গে আরও একটি কথা দাদি বলেছিলেন, তা হলো, 'যেই মাইয়ার রূপ বেশি, হ্যায় পোলা পয়দা করতে পারে না কোনোদিন।' এই কথাটা শুনে সেদিন আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আম্মা কিছুই বলেনি, চুপচাপ নিজের কাজ করছিল। পরীকে কোলে রাখতো রুপা আর স্কুল থেকে ফিরে এসে আমি। ও যখন ছোটো ছোটো হাত-পাগুলো নাড়াতো তখন আমার খুব ভালো লাগতো। আম্মা বলে, আমার আর রুপার থেকেও পরী বেশি সুন্দর। গালে একটু ছোঁয়া পড়তেই ওর গাল দুটো লাল হয়ে যেত, মনে হতো রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। সেই ভয়ে পরীকে বেশি কোলে নিতাম না। পাছে যদি ব্যথা পায়! কিন্তু রুপা ছোট্ট পরীকে কোলে নেওয়ার জন্য সবসময় আঁকুপাঁকু করতো। পরীকে কোলে নিয়ে বারান্দার দাওয়ায় বসে বৃষ্টি দেখতো রুপা, আর আমি তার পাশে মোড়া পেতে বই নিয়ে বসে থাকতাম। পরী যখন ছোটো ছোটো পা ফেলে হাঁটতো তখন দেখতে বেশ লাগতো ঠিক মোমের পুতুলের মতো।

আমাদের দ্বিতীয় আম্মাকে দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিই কিন্তু রুপা আর পরী তো বোঝে না। ছোটো তো, ওরা দুজনেই ওই মহিলার আশপাশে ঘুরঘুর করতো। পরীকে যখন উনি কোলে নিতো আমিই দৌড়ে গিয়ে ওনার কোল থেকে ছিনিয়ে আনতাম পরীকে। কিছু না বললেও মনে মনে কষ্ট পেতেন উনি। এতে আমি খুব খুশি হতাম। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি যখন ওই মহিলারও একটা কন্যাসন্তান হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওনার মেয়েটা মারা যায়। এরপর আরও একটি মেয়ে জন্ম দেন কিন্তু সেই বাচ্চাটাও মারা যায়, তারপর যখন..."

আর পড়তে পারলো না পরী, তার আগেই ডাক পড়লো আবেরজান বেগমের। সঙ্গে-সঙ্গে বিষাদের ছায়া নেমে এলো পরীর মুখে। সবেমাত্র খাতাটা খুলে পড়তে বসেছিল সে। একটু পড়তে-না-পড়তেই ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। চোখমুখ কুঁচকে সে পড়ার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো। শব্দ করে ঠেলে চেয়ারটা কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দিলো। সিমেন্টের মলাটে আবৃত খাতাটা বন্ধ করে সযত্নে বইয়ের ভাঁজে রেখে দিয়ে ছুটলো দাদির ঘরে।

সেখানে যেতেই চোখ গেল পালঙ্কের উপর বসে থাকা আবেরজান বেগমের দিকে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছেন তিনি। পরী বড়ো-বড়ো পা ফেলে এগিয়ে গেল। পালঙ্কের হাতল ধরে জোর গলায় বলে উঠল, 'কী হইছে?'

আবেরজান ঘাড় ঘুরিয়ে পরীর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'মাইয়া মানুষ এত ধুপধাপ শব্দ করে হাঁটোস ক্যান? আস্তে হাঁটতে পারোস না?'

দাদির জ্ঞানমূলক কথাবার্তা কোনোকালেই পছন্দ নয় পরীর। যখনই সামনে আসবে তখনই একটা-না-একটা জ্ঞানের কথা বলবেই। পরী দাদির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'তুমি কী কইবা তাড়াতাড়ি কও, আমার মেলা কাম আছে!'

আবেরজান হাতের ইশারায় নিজের পানদানি দেখিয়ে বললেন, 'একখান পান দে।'

আগের ন্যায় ধুপধাপ পা ফেলে জলচৌকির দিকে এগিয়ে গেল সে। হাঁটু গেড়ে বসে পান বানিয়ে এনে দাদির হাতে দিতেই তিনি পানটা মুখে পুরে নিলেন। পরী কৌটা থেকে কিছুটা চুন দাদির তর্জনী আঙুলে মেখে দিয়ে কৌটাটা আগের স্থানে রেখে দিলো। বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ফিরে তাকালো দাদির পানে। সেই লেখাগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। পরী এগিয়ে গেল দাদির কাছে। তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো, দাদির গায়ের রং বেশ চাপা কিন্তু অতটা কালো নয়। হাত-পা ও মুখের চামড়া ঝুলে গিয়েছে। বয়স হয়েছে তো! পরী হুট করেই বলে উঠল, 'যেই মাইয়ার রুপ বেশি, হ্যায় পোলা পয়দা করতে পারে না, তাই-না দাদি?'

পরীর কথা শুনে চমকে তাকালো আবেরজান বেগম। এই কথা পরী শুনলো কোথা থেকে? দাদিকে বলতে না দিয়ে পরী আবার বলে, 'তোমার তো রুপ নাই। তাই তো দুইটা পোলা পয়দা করছো। কিন্তু একটারেও তো মানুষ করতে পারো নাই। দুইটা অমানুষ পয়দা করছো। বুড়ি কোহানকার, আমার আম্মাজান তিনটা সোনা জন্ম দিছে আর তুমি কী করছো? এক পোলায় দুইডা বিয়া করছে আরেক পোলার বিয়ার খবর নাই। পরের মাইয়া দেইখা দেইখা দিন পার করে।'

কথাগুলো বলে পরী একদণ্ড দেরি না করে দৌড়ে বাইরে চলে গেল, আবেরজান বেগমকে কিছু বলতেই দিলো না। নিজের নাতনির উপর ক্ষুব্ধ হলেন আবেরজান। মেয়েটা এত চটপটে আর উড়নচণ্ডি স্বভাবের যে, মুখের বুলিতে সবসময় তেজ মিশ্রিত থাকে যা ওনার আর দুই নাতনির মধ্যে কোনো ক্ষণেই দেখেননি। পরীর এরকম কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত তাই বেশি না ভেবে পান খাওয়ায় মন দিলেন।

দাদির ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে নিজের শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়াতেই আবার ডাক পড়লো। এবারের ডাকটা দিয়েছেন পরীর মা মালা বেগম। মায়ের ডাক শুনে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হলো পরীর। সোনালী আপার খাতাটা আজকে বোধ হয় আর পড়া হবে না। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার টেবিলের দিকে তাকালো সে। বইয়ের সাজানো স্তূপের মধ্যে আসামির ন্যায় পড়ে আছে খাতাটা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন পরীকে, কিন্তু সময়ের অভাবে সে আসতে পারছে না। অসহায় নয়নে শুধু খাতাটা দেখতে লাগল সে। এরমধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ডেকে উঠল মালা। পরী দৌড় লাগাল। পরনের ঘাগড়াটা দুহাতে হালকা উঁচু করে ধরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে দৌড় দিলো রন্ধনশালার দিকে। সেখানে বসেই ডাকছিলেন মালা। পরী ওখানে গিয়ে দাঁড়াতেই জেসমিনের দিকে চোখ পড়লো, সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ ফিরিয়ে নিলো। বড়ো একটা গামলায় কুঁচো চিংড়ি বোঝাই করা। সেগুলো বাছাই করছে দুজনে মিলে। মালা পরীকে খেয়াল করেনি, তিনি চিংড়ির খোসা ছাড়াচ্ছেন আর কাশছেন। পরী দু-পা ভাঁজ করে মায়ের পাশে বসে হাত ধরে বলল, 'আম্মাজান, আপনে অসুখ নিয়া কাম করতে আইছেন ক্যান? পানি ধরলে তো আপনার কাশি আরও বাড়বো।'

কথাটা শেষ করে পরী গরম চাহনিতে একবার জেসমিনের দিকে তাকালো। তারপর আবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘরের কেউ কি দেহে না যে আম্মার অসুখ? তারপরেও আম্মারে কামে ডাকে কোন সাহসে? আমার আম্মার কিছু হইলে আমি কিন্তু কাউরে ছাইড়া দিমু না কইয়া দিলাম।'

জেসমিন এবার মুখ খুলল, 'আমি আপারে মানা করছিলাম পরী, কিন্তু সে শোনে নাই।'

পরী আবারও রাগমিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'হইছে, আপনারে আর অজুহাত দিতে হইবো না। যা করার...'

পরবর্তী শব্দ উচ্চারণ করার আগেই মালা কষে চড় মারেন পরীর গালে। এতে পরীর কোনো ভাবান্তর হলো না। প্রতিদিন দু-চারটে চড় না খেলে তার পেটের ভাত হজম হয় না, তাও মায়ের হাতের। মুখে আঁচল দিয়ে কাশতে কাশতে মালা বলল, 'কতবার কইছি মুখে মুখে তর্ক করবি না। জেসমিন তোর ছোটো আম্মা হয়।'

পরী মাথা নিচু করে নিলো তবে রাগ ওর মধ্যে এখনও বিদ্যমান। মাথা নিচু করেই সে বলে, 'ছোটো আম্মা কিন্তু আম্মা না।'

মালা ফের কিছু বলতে উদ্যত হলে জেসমিন থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক আপা, পরীরে কিছু বইলেন না, ছোটো মানুষ।' এরপর পরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'পরী, তুমি জুম্মানরে নিয়া শাপলা বিলে যাও। ঘরে একটা মানুষও নাই তাই তোমারে কইতাছি, কতগুলা শাপলা নিয়া আসো। চিংড়ি দিয়া রান্না হইবো। আজকে ঘরে মেহমান আসবে।'

কপালে দৃঢ় ভাঁজ পড়লো পরীর। অবাক করা কণ্ঠে বলে, 'এই বন্যার ভিতরে মেহমান আইবে কই থাইকা?'

পরমুহূর্তে কিছু ভেবেই পরীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'রুপা আপা আইবো?'

মালা দিলেন এক ধমক, 'এত কথা কস ক্যান, তাড়াতাড়ি যা। আর শোন, মুখটা ভালো করে ঢাইকা যাবি কেউ যানি না দেখে। নৌকার ছইয়ের মধ্যি থাইকা বাইর হবি না। জুম্মানরে নিয়া এহন যা। তোর বাপে আর তার লোকজন থাকলে তোরে পাঠাইতাম না। এমন সময়ডাতে বাড়ি খালি!'

মৃদু রাগ দেখা গেল মালার মুখে। কিন্তু পরী বেজায় খুশি, আজকে অনেক দিন পর বাইরে বের হবে সে। দৌড়ে নিজের কক্ষে চলে গেল। ওড়না দিয়ে নিজের মুখ ভালো করে বেঁধে নিলো। শুধু চোখদুটো খোলা রাখলো। দাদির ঘর পেরিয়ে আসার সময় উঁকি দিলো পরী। আবেরজান আয়েশ করে বসে বসে সুপারি কাটছেন। পরী হাঁক ছাড়লো, 'ও বুড়ি!'

সুপারি কাঁটা রেখে পরীর দিকে তাকালেন তিনি। পরীকে এই সাজে দেখে তিনি বুঝে ফেললেন যে আজকে পরী ঘরের বাইরে বের হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কই যাস?'

পরী ভেংচি কেটে বলল, 'তা দিয়া তোমার কাম নাই। আমি এহন যাই, আসমান থাইকা যদি তোমার সোয়ামি ডাক দেয় তাইলে ভুলেও যাইয়ো না কিন্তু। দ্যাশ বন্যার পানিতে ভাইসা গেছে, তোমারে কবর দেওয়ার জায়গা পামু কই?'

পরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে চলে গেল। আবারও রাগ হলো আবেরজানের। তার ভাষ্যমতে মেয়েদের জোরে হাসতে নেই, কাশতে নেই, এমনকি কাঁদতেও নেই। মেয়ে-মানুষ থাকবে মোমের মতো। আগুনের স্পর্শ পেলে নীরবে গলে যাবে। জ্বলবে পুড়বে ছাই হবে তবে মুখ থেকে শব্দ বের হবে না। কিন্তু পরীর স্বভাব তার ধারণার বাইরে। তাই তিনি ঠিক করলেন আজকে মালাকে বলে এই মেয়ের একটা ব্যবস্থা করবেই করবে।

গ্রামের নাম নূরনগর। পদ্মানদীর ধার ঘেঁষেই এই গ্রামের অবস্থান। পদ্মা যেন নূরনগরে নূরের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটি ঋতুতে এই গ্রাম নানান বাহারে সজ্জিত হয়ে উঠে। কখনো গরমে উওপ্ত পথিকের আর্তনাদ, কখনো বর্ষার মেঘমালা থেকে সৃষ্টি বারিধারা, স্বচ্ছ নীলাম্বরে মেঘের ভেলা, ঘাসে জমে থাকা শিশির কণার রূপবত্তা তো কোকিলের মধুর কণ্ঠ। সব মিলিয়ে গ্রামের এই সৌন্দর্য সবার মন কাড়ে। কিন্তু এখন আর এই গ্রামে সেই সৌন্দর্য নেই। পাঁচদিন ধরে এই রূপবান গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে আছে। টানা বর্ষণের ফলে পদ্মা উপচে জলস্রোত দ্রুত তলিয়ে দিয়ে গেছে এই গ্রামের সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেক গ্রাম। গরিব-অসহায় মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয়কেন্দ্রে। কেউ কেউ নৌকা নিয়ে ভাসছে কিংবা কলাগাছের ভেলায়। দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দিয়েছে সারাদেশে এই প্রলয়ংকারী সর্বনাশা বন্যা। ঠিক এইরকম বন্যা হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে ১৯৮৮ সালে। এতগুলো বছর পর আবার সেই বন্যার মুখোমুখি সবাই। কেউই জানে না এই বন্যা কতদিন থাকবে, কতদিন মানুষ না খেয়ে অসহায় হয়ে পড়ে থাকবে? তারা কি বাঁচবে নাকি অসুখে অনাহারে অকালে প্রাণ হারাবে!

নৌকার ছইয়ের ভেতরে বসে আছে পরী। দুপাশে পর্দা টেনে দিয়েছে। এটা মায়ের কড়া হুকুম। আর জুম্মান নৌকা বাইছে। পরী ছইয়ের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-রে জুম্মান, আজকে নাকি মেহমান আইবো? কারা আইবো জানোস?'

বৈইঠা হাতে নৌকা ঘুরাতে ঘুরাতে জুম্মান জবাব দিলো, 'শহর থাইকা ডাক্তার আইবো আপা। বন্যার পানিতে ভিজে অনেকের অসুখ হইছে। হ্যার লাইগা আব্বা শহর থাইকা ডাক্তার আনতাছে। তারাই আইবো।'

'তোরে কইছে কেডা?'

জুম্মান অকপটে স্বীকার করে বলে, 'বড়ো আম্মায় কইছে?'

পরী আর জবাব দিলো না। শাপলা বিলে নৌকা আসতেই পরীর মনটা খুশিতে নেচে উঠল। যদিও শাপলা বিল আর আগের মতো নেই। পানিতে টুইটম্বুর, কোনটা বিল আর কোনটা খেত বোঝা মুশকিল। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো নিজেকে এখন মুক্ত মনে হচ্ছে পরীর। আজকে তো সে বিলের পানিতে সাঁতার কাটবে তাতে মা বকলে বকুক, মারলে মারুক। কিন্তু তখনই বিপত্তি ঘটে গেল। পরীর ইচ্ছা ইচ্ছাই রয়ে গেল জুম্মানের কথায়, 'আপা, আমাগো আরেক খান নৌকা আইতাছে এইদিকে।'

কৌতূহল হয়ে পরী প্রশ্ন ছুড়ে দিলো, 'নৌকায় কেডা দেখ তো?'

জুম্মান দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলল, 'লতিফ কাকা ও দেলোয়ার কাকা, আর লগে মাঝি।'

সঙ্গে-সঙ্গে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল পরীর। এটা নিশ্চয়ই ওর মায়ের কাজ। কাজের লোকগুলো বাড়িতে আসতেই পাঠিয়ে দিয়েছে। পরীর আর ভালো লাগে না এইরকম খাঁচায় বন্দি পাখি হয়ে থাকতে। একা খোলা আকাশে মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চায় সে। কিন্তু ওর মায়ের জন্য তা আদৌও কখনো সম্ভব হবে কি? কথায় কথায় কসম দিয়ে পরীকে চুপ করিয়ে দেন তিনি। পরী জড়োসড়ো হয়ে বসেই রইল ছইয়ের ভেতরে।

সম্পান মাঝি দাঁড় বাইছে সঙ্গে আরও দুজন মাঝিও আছে। বিশালাকৃতির নৌকাখানি টেনে নেওয়া একটুখানি কথা না। তিন-চার জন মাঝি তো লাগবেই। ঘাম ছুটে গেছে সবার। হঠাৎ করেই কেউ ডেকে উঠল, 'ও সম্পান মাঝি, ওইদিকে কই যাও? খাঁড়াও দেহি একটুখানি।'

সম্পান বাঁশের সাহায্যে নৌকা থামিয়ে দিলো তৎক্ষণাৎ। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকা থেকে বিন্দু বের হয়ে এলো। পরনে অর্ধ-নোংরা শাড়ির আঁচল কোমড়ে গুঁজে দিয়ে শুধালো, 'ওই দিকে কই যাও?'

সম্পান নৌকার ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'জমিদার বাড়ি যাইরে বিন্দু। ডাক্তার আনছি শহর থাইকা, হেগোরে দিতেই যাইতাছি।'

বিন্দু উঁকি দিলো নৌকার ছইয়ের ভেতর, তারপর বলল, 'ওইদিক দিয়া যাইয়ো না মাঝি। সখারে দিয়া আমারে খবর দিলো পরীবানু আইজ শাপলা বিলে আইছে, ওর লগে দুই খাটাইশও আইছে। গেলে ভালা হইবো না।'

সম্পানের মুখে চিন্তার ছাপ দেখা দিলো। সে আড়ষ্ঠ কণ্ঠে বলল, 'কস কী? পরী আহার সময় পাইলো না! অন্যদিক দিয়া গেলে অনেক ঘুরা পড়বো। আমাগো তো জলদি যাইতে হইবো। এহন কী করি?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সম্পান আবার বলে উঠল, 'তুই লগে আয় বিন্দু, তাইলে আমাগো কিছু কইবে না। তুই পরীরে কইলেই পরী শুনবো।'

বিন্দু মৃদু রাগ নিয়ে বলল, 'হুঁ, খালি তো আমারেই পাও। পরী খবর দিছে তাও যাইতে পারলাম না। চুলায় শাক চড়াইছি। রান্ধা শ্যাষ না হইলে যাইতাম না।'

সম্পান অপেক্ষা করলো বিন্দুর রান্না শেষ হওয়া অবধি। অগত্যা যেতেই হলো বিন্দুকে। এবার বোধ হয় পরী তাকে বিলের পানিতে চুবাবে। বিন্দু নৌকায় বসতেই মাঝিরা নৌকা ছাড়লো। নৌকায় বসা সবাই এতক্ষণ বিন্দু ও সম্পানের কথা শুনছিল। কিন্তু কথাগুলো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি কেউ। একটি মেয়ে কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেই বসে, 'পরী কে?'

বিন্দু ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'আমাগো গেরামের জমিদারের ছোডো মাইয়া।'

বিশাল ছই বাঁধানো নৌকাটি থামলো গাঁয়ের জমিদার আফতাব উদ্দিনের বাড়ির সামনে। গাঁয়ের সব ঘরবাড়ি বন্যায় তলিয়ে গেলেও জমিদার বাড়ির উঠোন ছুঁতেও পারেনি এই পানি, কিন্তু যদি টানা আরও কয়েকদিন বৃষ্টি হয় তবে অনায়াসে এই বাড়ির উঠোনে পানি প্রবেশ করবে তা নিশ্চিত বলা যায়। উঁচু জায়গায় বাড়িটি হওয়ার দরুন বন্যার পানি স্পর্শ করেনি এই বাড়িটিকে। মোঘল আমলের বাড়ি। যদিও সময়ের ব্যবধানে জমিদারি প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। আফতাব উদ্দিনের বাবা এককালে জমিদার ছিলেন। সেই থেকেই এটা 'জমিদার বাড়ি' নামে পরিচিত। আফতাব উদ্দিনকেও সকলে জমিদার হিসেবেই মান্য করেন। বলতে গেলে পিতার জমিদারি কিঞ্চিৎ হলেও ধরে রেখেছেন।

সামনের উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা পেরুলেই ডানে বামে দুটি বড়ো বড়ো পাকা ঘর। তারপর আরও একটি দরজা পেরুলেই বড়ো দোতলা দালানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাড়ির দেয়ালগুলো কেমন নিস্তেজ। রং উঠে গিয়ে কেমন সবুজাভ বর্ণ ধারণ করেছে। আফতাব চাইলে এই বাড়ি নতুন করে রং করাতে পারে কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তার পূর্বপুরুষদের চিহ্ন এই বাড়ি। তাদের ছোঁয়া আছে এই বাড়ির প্রতিটি আনাচে-কানাচে। অভিজাত্যের ছোঁয়া তাই এই বাড়িতে তিনি দিতে চান না। বৃষ্টি-বাদলে দেয়াল ভিজে কালচে হয়ে যাচ্ছে তবুও বাড়ির দিকে ফিরেও তাকান না তিনি। এতে লোকে যা বলার বলুক তাতে তিনি কান দেন না।

নৌকা থেকে বের হয়ে এলো ছয় জন যুবক-যুবতি। তাদের ব্যাগগুলো মাঝিরা বের করছে। ছেলে তিন জন নৌকা থেকে নেমে এলেও মেয়ে তিন জন আসতে পারলো না। কারণ সামনে কাদায় ভরা। এখানে নামলে নির্ঘাত আছাড় খাবে ওরা। তাই সম্পান কাঠের তক্তাটা নৌকা থেকে মাটি বরাবর রাখলো। সহজেই মেয়েগুলো নেমে পড়লো। সবাই নিজেদের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনে আসতেই অবাক হয়ে দেখতে লাগল বাড়িটি। সত্যিই বাড়িটি অনেক পুরোনো। সদর দরজার সম্মুখে আসতেই দুজন জোয়ান লোক লাঠি হাতে সামনে দাঁড়ালো। গমগম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কারা আপনারা? কী চাই?'

নাঈম লোকটির কথার জবাব দিলো, 'আমরা শহর থেকে এসেছি। এই গ্রামের জমিদার এনেছেন আমাদের। বন্যায় অনেক মানুষ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই,'

কথা শেষ করতে পারলো না নাঈম, তার আগেই পেছন থেকে সম্পান বলে উঠল, 'আরে দাদা, ওনারা ডাক্তার। জমিদার-বাবু শহর থাইকা আনাইছেন।'

আর কথা বলতে হলো না সম্পানকে। লোক দুজন সবাইকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলো। সদর দরজা পেরিয়েই বৈঠকঘরে আসলো সবাই। তৎক্ষণাৎ একটা মেয়ে দৌড়ে এসে বলল, 'খাঁড়ান বাবু, পুরুষ-মানুষ ভেতরে যাইতে পারবেন না। আপনেরা এইহানে বহেন আমি বড়ো-মা'রে ডাইকা আনতাছি।'

ওদের বসতে দিয়ে মেয়েটা ছুটে ভেতরে চলে গেল। নাঈম ইশারায় সবাইকে বসতে বলে নিজে একটা কাঠের চেয়ার টেনে বসলো। শহর থেকে ছয় জন এসেছে ওরা। আরও কয়েকজন বড়ো ডাক্তার আসবে তবে একটু সময় লাগবে। মেডিক্যালের স্টুডেন্ট ওরা। নাঈম, আসিফ, শেখর, মিষ্টি, রুমি ও পালক। ওদের টিম প্রতিটি দলে ছয় জন করে ভাগ হয়ে একেক গ্রামে গিয়েছে। দেশের অবস্থা ভালো না। বন্যায় ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। সঙ্গে-সঙ্গে অসুখও বাড়ছে, বিশেষ করে কলেরা। গ্রামের মানুষেরা সতর্ক থাকে না বিধায় এইসব রোগ বেশি হয়, তাই ওরা এসেছে সবাইকে সতর্ক করতে এবং চিকিৎসা করতে। অবশ্য সব ধরনের ট্রেনিং করেই এসেছে। তবুও বড়ো ডাক্তার সামনের সপ্তাহে এসে দেখে যাবেন।

বড়োসড়ো ঘোমটা টেনে বৈঠকঘরে এলেন মালা। সঙ্গে একটু আগে আসা মেয়েটিও। মালা নিচু স্বরে বললেন, 'কুসুম, হেগোরে নাশতা-পানি দে।'

সঙ্গে-সঙ্গে কুসুম সবাইকে শরবত আর পিঠা দিলো। শরবত খেয়েই সবাই ক্ষান্ত হলো, আপাতত আর কিছু খাবে না ওরা। মালা কুসুমকে দিয়ে ছেলেদের বৈঠকঘরের পাশের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। আর মেয়েদের নিয়ে ঢুকলেন মহিলা অন্দরে। মালা ওদের নিয়ে পরীর ঘরেই বসালো। তারপর আবার রান্নাঘরে চলে গেল কাজে।

পরী এখনও আসছে না দেখে চিন্তিত মালা। ঘরে তিন জন নতুন পুরুষ এসেছে, না-জানি মেয়েটা কোন অবস্থাতে ঘরে এসে ঢোকে। তাই তিনি আগেভাগেই কুসুমকে পাঠিয়ে দিলেন নৌকাঘাটে। কুসুম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে রইল পরীর অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ পরেই দুইটা নৌকা ভিড়ল পাড়ে। জুম্মান হাতে এক মুঠো শাপলা নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। লতিফ আর দেলোয়ার বাকি শাপলা নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সবশেষে বের হলো পরী। ওর হাতে একগুচ্ছ শাপলা। শাপলা দিয়ে একটা মালা বানিয়ে গলায় জড়িয়েছে সে। কুসুম দৌড়ে গিয়ে পরীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'পরী আপা, তাড়াতাড়ি ঘরে চলেন। বড়ো-মা কইছে আপনের ঘরে যাইতে। আর বাইর হওয়া যাইবো না। ঘরে তিন জন নতুন পুরুষ আইছে। আহেন আমার লগে।'

পরী নিজের ঘাগড়া উঁচু করে ঝাড়ছিল। কুসুমের কথায় হাত আপনা-আপনি থেমে গেল তার। বুঝতে বাকি রইল না যে এরাই সেই মেহমান, যাদের কথা সকালেই ওর আম্মা বলেছিল। পরী বলল, 'ক্যান, এদেরকে আম্মা ঘরে ঢুকতে দিলো ক্যান?'

কুসুম গলা ঝেড়ে বলল, 'ক্যান দিবো না। শহরের ডাক্তার তারা। রোগী দেখতে আইছে। থাকতে তো দিবোই।'

কুসুম আর কথা বলতে পারলো না। তার আগেই ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির বড়ো-বড়ো ফোঁটা ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের। জুম্মান আগেই ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরী আর কুসুম একসঙ্গে দৌড় লাগাল। হাতের শাপলাগুলোর পাপড়ি ঝরে পড়তে লাগল মেঝেতে। বৈঠকঘরের উঠোন পাকা করা। পরীর কর্দমাক্ত পা ফেলার দরুন পায়ের ছাপ সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সঙ্গে শাপলার পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। নাঈম ঘরের বারান্দায় বসে বসে নিজের জুতো পরিষ্কার করছিল। আসার সময় কাদা লেগে গেছে। হঠাৎ কারও পায়ের শব্দে উঠোনের দিকে তাকালো। দুজন মেয়ে দৌড়ে চলে গেল। তারমধ্যে একজনকে নাঈম চেনে। সে হলো কুসুম, এই বাড়ির কাজের মেয়ে। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে সে চিনলো না। ওড়নাটা বোরকার নেকাবের ন্যায় পরে আছে বিধায় মুখটাও দেখতে পারলো না সে। মেঝেতে তাকিয়ে একদৃষ্টিতে পরীর পায়ের ছাপ আর শাপলার পাপড়িগুলো দেখতে লাগল। বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সে পায়ের ছাপ। বৃষ্টির পানিতে ধুয়েমুছে গেল। নাঈম বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিজ রুমে চলে গেল।

বৈঠকঘর পেরিয়ে মহিলা অন্দরে ঢুকতেই বৃষ্টির তোড় যেন বাড়লো। বড়ো উঠোন পেরিয়ে খোলা বারান্দায় আসতে আসতেই ভিজে গেছে পরী। হাতের শাপলাগুলো মেঝেতে রেখে হাত-পা ঝাড়লো সে। কুসুম ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গেছে, বাড়িতে মেহমান এসেছে রান্না করতে হবে তো! ভেজা জামাকাপড় ছাড়বে বলে পরী আবার দৌড় দিলো। ধুপধাপ শব্দ এলো পরীর পায়ের। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল নিজের ঘরে অচেনা গন্ধ পেয়ে। রুমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পালক আর মিষ্টি ব্যাগ খুলে কিছু খোঁজায় ব্যস্ত। কারও আগমনের আভাসে দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। পরীকে দেখে চিনলো না ওরা। পরী নিজ কক্ষে প্রবেশ করতে করতে বলল, 'কারা আপনারা, আমার ঘরে কী করেন?'

ওরা দুজনেই থতমত খেয়ে গেল। কার ঘরে মালা ওদের রেখে গিয়েছে তা ওরা জানে না। যেখানে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে ওরা সেখানেই থাকছে। পরী আরেকটু কাছে এসে দাঁড়িয়ে আবার একই প্রশ্ন করতেই মিষ্টি জবাব দিলো, 'আমরা শহর থেকে এসেছি। এই গ্রামের জমিদারের গিন্নি মানে মালা বেগম আমাদের এই ঘরে থাকতে বলেছেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে পরীর রাগ আসমান ছুঁয়ে গেল। যেখানে নিজের জিনিসপত্রে কারও হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না সেখানে একই ঘরে এই মেয়েদের নিয়ে সে থাকবে কীভাবে? সঙ্গে-সঙ্গেই পরী গলা ফাটিয়ে মালাকে ডাকতে শুরু করে দিলো, 'আম্মা, আম্মা, আম্মাজান এট্টু এদিকে আহেন?'

কিন্তু মালার পরিবর্তে ঘরে এসে হাজির হলো আবেরজান বেগম। লাঠিতে ভর দিয়ে এসে তিনি বললেন, 'মাইয়া মানুষ এত গলা বাজাস ক্যান, তোরে না করছি না? এত চিল্লাস ক্যান বারবার?'

পরী দ্রুত পদে দাদির নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমারে না জানাইয়া আমার ঘরে অন্য মানুষ ঢুকতে দিলা ক্যান?'

আবেরজান পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'অহনই তো আইলো ওরা। একটু জিরাইতে দে? তোর মায়ের মেলা কাম এহন। পরে ওগোরে অন্য ঘরে দিয়া আইবো। তুই ভিইজা গেছস, কাপড় বদলা।'

লাঠির ভরে চলে গেলেন আবেরজান। মিষ্টি আর পালক লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলেছে। প্রথম দিনেই এত বড়ো অপমান মেনে নিতে পারলো না কেউ। মেয়েটা কীভাবে সামনাসামনি কথাগুলো বলে ফেলল? রুমি এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল, পরীর চিল্লানোর ফলে ধড়ফড়িয়ে ওঠে সে। পরবর্তী কথাগুলো ওর কানে যেতেই লজ্জাবোধে মাথা নিচু করে ফেলে। এখন ওদের মনে হচ্ছে এই গ্রামে আসাটাই ভুল হয়েছে।

পরী কথা না বলে সামনে পা বাড়ালো। কাঠের সঙ্গে লাগানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার সামনে কয়েকটা কৌটা আর কতগুলো রং-বেরঙের ফিতা। এতক্ষণ ধরে মুখে ওড়না বাঁধা থাকলেও এখন সেটা একটানে খুলে ফেলল। তারপর চুল থেকে ফিতার বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হলো।

মিষ্টি আর পালক চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাতে পারলো না। কিন্তু রুমির ধাক্কায় সেদিকে দুজনে তাকালো। রাগ জড়ানো কণ্ঠে পালক বলল, 'কী হয়েছে, ধাক্কা দিচ্ছিস কেন?'

রুমি হাঁ করে সামনের দিকে চোখ রেখে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-রে, এটা কি মেয়ে নাকি কোনো মোমের পুতুল? একটু কি ছুঁয়ে দেখবো?'

রুমির কথার মানে ওরা দুজনে বুঝতে পারলো না। রুমির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাতেই ওদের দৃষ্টি স্থির হলো সামনের আয়নাতে। আয়নার প্রতিবিম্বে যেন একটা পরীর আগমন ঘটেছে। পুরো পুতুলের মতোই লাগছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে। গায়ের রং-টা উজ্জ্বল ফরসা। তার উপর পানির ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে। এই প্রথম মেয়ে হয়ে কোনো মেয়ের উপর চোখ আটকে গেছে ওদের। ঘোর থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না ওরা। চুল থেকে বেগুনি রঙের ফিতা দুটি খুলে রেখে ওড়না হাতে পিছনে ঘুরতেই তিন জন যুবতিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরী কপাল কুঁচকালো। তবে কিছু বলল না। কাঠের তৈরি আলমারি থেকে নিজের কাপড় বের করে ঘর থেকে বের হতে গেলে পালকের ডাকে থমকে দাঁড়ায় পরী। পালক জিজ্ঞেস করে বসে, 'নাম কী তোমার?'

পরী পেছনে না ফিরেই উত্তর দিলো, 'পরী।'

অতঃপর ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল সে। এবার ওদের কাছে সব পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এই মেয়ের কথাই বিন্দু আর সম্পান বলাবলি করছিল। বিন্দুকে সঙ্গে করে নিয়েই ওরা শাপলা বিলে আসে। কিন্তু তার আগেই লতিফ আর দেলোয়ার ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিছুতেই ওদের এদিক দিয়ে যেতে দিবে না ওরা। সম্পানের অনেক অনুরোধেও লতিফের মন গলল না। কারণ জমিদার-কন্যা পরীর কড়া হুকুম সে থাকাকালীন শাপলা বিলে কোনো বহিরাগত পুরুষের আগমন ঘটতে পারবে না। শাপলা বিলে সাঁতার কাটার জন্য কথাটা পরী বলেছিল কিন্তু তবুও তার সাঁতার কাটা হলো না। শেষে বিন্দু পরীর নৌকায় গিয়ে ফিসফিসিয়ে শলাপরামর্শ করে অনুমতি নিলো। তারপর সম্পান নৌকা নিয়ে অনায়াসে শাপলা বিলে বৈঠা ফেলল। পালক ভেবেছিল জমিদার-কন্যা না-জানি কেমন হবে? কিন্তু সামনাসামনি দেখলো এ তো একটা পুঁচকে মেয়ে। বয়স চৌদ্দ কি পনেরো হবে। এই মেয়ের রূপের যেমন তেজ মেজাজেরও তেমন ঝাঁঝ। সবমিলিয়ে আগুন বলা যায়।

মিষ্টি বড়ো একটা দম ফেলে বলল, 'এটা মেয়ে নাকি বিছুটি পাতা? এভাবে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে? শহর থেকে এসেছি, মেহমানই তো ওদের। সেজন্য এভাবে কথা বলবে?'

তবে মিষ্টির কথা কেউ কানে তুলল না। রুমি চোখ কঁচলে বলল, 'এত সুন্দর মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম।'

'হবেই তো। দেখলি-না, পরীর মা কত সুন্দর! যৌবনকালে ওই মহিলারও উনার মেয়ের মতোই রূপ ছিল। মায়ের মতোই হয়েছে মেয়েটা।'

পালকের কথায় রুমি খাট থেকে নেমে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছেলে হলে এই মেয়েটাকে এখুনি বিয়ে করে ফেলতাম।'

হাসলো পালক, 'তোর মতো সাধারণ মেডিক্যাল স্টুডেন্টের কাছে জমিদার তার মেয়ের বিয়ে দিতো বুঝি?'

'জমিদার, রাজকুমার আর রাজা হওয়ার একটা সুবিধা আছে জানিস? রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে।'

পালক আর রুমির দুষ্টুমি পছন্দ হলো না মিষ্টির। মেয়েটার নাম মিষ্টি, কিন্তু কথায় ঝাল মেশানো থাকে সবসময়। মূল কথা হলো পরীর সৌন্দর্য ওর পছন্দ হয়নি। গায়ের সৌন্দর্য ঠিক আছে তবে মনটা এতটুকুও সুন্দর না। পরীর অপমান এখনও গায়ে লেগে আছে ওর।

দুপুরে খাওয়ার ডাক পড়তেই সবাই একসঙ্গে খেয়ে নিলো কিন্তু খাওয়ার সময় ওরা পরীকে দেখতে পেল না। ছেলেদের আগে খেতে দেওয়া হলো এবং মেয়েদের পরে। খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বের হলো ওরা। ঘাটে ওদের জন্য নৌকা বাঁধা আছে। ব্যাগপত্র নিয়ে দ্রুত নৌকায় চেপে বসে সবাই। এখন ওরা গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে। সেখানে শতাধিক মানুষ আছে। অর্ধেকের বেশি অসুস্থ। সেখান থেকে ওরা জমিদারের বাগানবাড়িতে যাবে। সেটিও বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত করেছেন আফতাব উদ্দিন। নৌকায় বসে পালক আর রুমি ফিসফিস করে কথা বলছে আর হাসছে। ওদের কাণ্ড দেখে নাঈম জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, তোরা নিজেদের মধ্যে কী বলছিস? আমাদেরকেও বল, শুনি?'

শেখর তাতে তাল মিলিয়ে বলল, 'বোধ হয় বিয়ের পর হানিমুন আর বাচ্চা-কাচ্চার প্ল্যান করছে।'

বলতে বলতে হাসলো শেখর। পালক শেখরের বাহুতে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'জি-না মশাই। আমরা জমিদারের মেয়ে পরীর কথা বলছি। জানিস, মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর, একদম পুতুলের মতো। নাম পরী আর দেখতেও পরীর থেকে কম নয়। আমি কখনো রাজকন্যা দেখিনি। কিন্তু রাজকন্যারা বোধ হয় এই পরীর মতোই দেখতে।'

কৌতূহল হয়ে পালকের কথা শুনতে লাগল শেখর, নাঈম আর আসিফ। তবে পুরোপুরি হয়তো কথাটা বিশ্বাস হলো না ওদের। আসিফ ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলল, 'ফাজলামো করছিস? গ্রামের এরকম নোংরা পরিবেশে এত সুন্দর মেয়ে!'

ধমকে উঠল রুমি, 'চুপ থাক। একটা মেয়ে কখনোই আরেকটা মেয়ের রূপের বর্ণনা দেয় না, দিতে চায় না। কিন্তু আমি না-দিয়েও পারছি না। আসলেই মেয়েটা খুব সুন্দর।'

নাঈম ওদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে তো দেখতে হচ্ছে মেয়েটাকে। দেখি কেমন সুন্দর?'

'তা দেখবি কীভাবে? অন্দরমহলে তো পুরুষ-মানুষ ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

রুমির দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকালো নাঈম। সত্যি তো! তা হলে কি পরীকে দেখা হবে না?

'যদি পরী বাইরে আসে তা হলে দেখবো।'

পালক ভেংচি কাটলো, নাঈমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অত সোজা না বাবু। ওই মেয়ে বাইরে বের হয় কীভাবে দেখোনি? আজকে শাপলা বিলে তো নৌকায় ওই পরীই ছিল। বাব্বাহ! কত জোর করে আমরা আসতে পারলাম।'

নাঈমের মুখে চিন্তার রেশ দেখা গেল। পালক আর রুমি যেভাবে মেয়েটার বর্ণনা দিলো, একবার না দেখা পর্যন্ত ও ক্ষান্ত হবে না। নাঈম বরাবরই একরোখা ছেলে। কিছু একটা মনে এলে ওটা সে করেই ছাড়ে। বলতে গেলে ওদের ডিপার্টমেন্টে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে একমাত্র নাঈম।

শেখর দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল, 'তা হলে আমরা রাতে চুরি করে অন্দরমহলে ঢুকবো, কী বলিস তোরা? আমি কিন্তু পরীকে না দেখে শহরে ফিরছি না।'

শেখরের কথায় সবাই হাসলো, শুধু মিষ্টি বাদে। ও ছইয়ের বাইরে বের হয়ে চারপাশ দেখছে। নাঈম শেখরের কথা ভেবে দেখলো মন্দ না। সে বলল, 'তা হলে আজ রাতেই মিশনে নেমে পড়া যাক? কী বলো?'

এবার আসিফও সায় দিলো। ও দেখতে চায় কেমন সুন্দর মেয়ে! পালক ওদের কথা শুনে মাথা নেড়ে বলল, 'পাগল তোরা সব। ধরা খেলেই বুঝবি। জমিদার মশাই তোদের গর্দান নিবে দেখিস। আহা রে, এসেছি ছয় জন যেতে হবে তিন জন।'

কথাটা আফসোসের সুরে বলল পালক। নাঈম বলল, 'আমরা ধরা খেলে তোদের নাম বলবো। তোরাই তো লোভ দেখালি। মেয়েটা এত সুন্দর! গর্দান গেলে সবার যাবে।'